তৃতীয় অধ্যায়
কৃষি ও জলবায়ু

এ অধ্যায়ে প্রথমে প্রতিকূল পরিবেশ ও বিরূপ আবহাওয়া সহিষ্ণু ফসল ও ফসলের জাতের বৈশিষ্ট্য, গুরুত্ব আলোচনা করা হয়েছে। পরবর্তীতে ফসল, মৎস্য ও পশুপাখি উৎপাদনে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। অধ্যায়ের শেষ দিকে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে ফসল, মৎস্য ও পশুপাখির অভিযোজন কৌশল ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

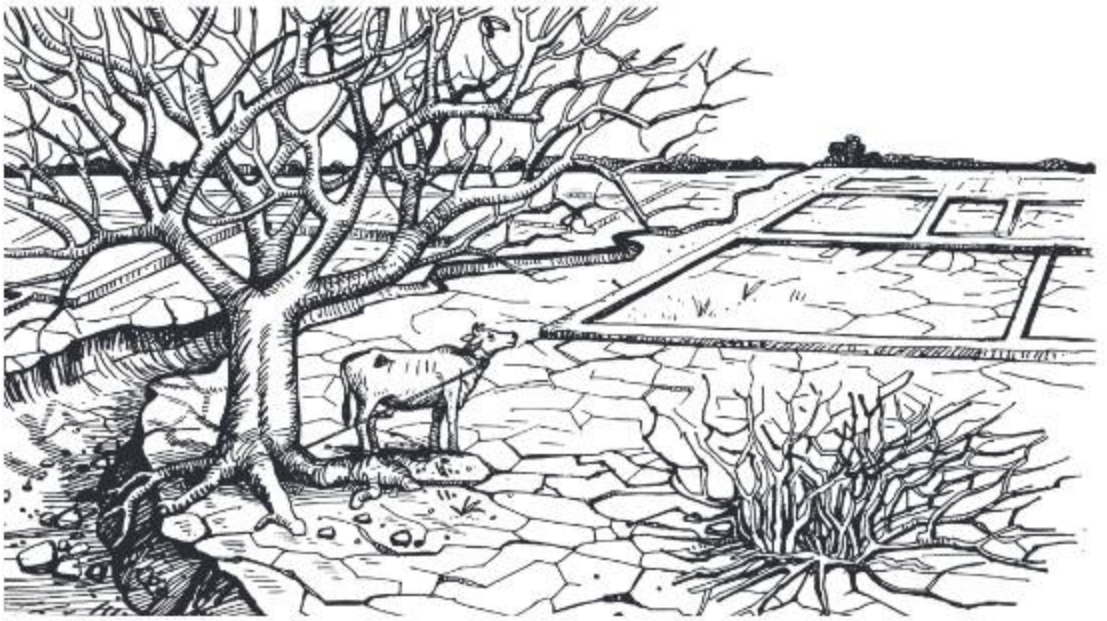

এ অধ্যায় শেষে আমরা–

- বিরূপ আবহাওয়া-সহিষ্ণু ফসলের জাতের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারব;
- বিরূপ আবহাওয়া-সহিষ্ণু ফসলের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব;
- কৃষি ক্ষেত্রের (ফসল, মৎস্য ও পশুপাখি) উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব বর্ণনা করতে পারব;
- কৃষি ক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মূল্যায়ন করতে পারব;
- জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে ফসল, মৎস্য ও পশুপাখির অভিযোজন কৌশল বর্ণনা করতে পারব;
- জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে ফসল, মৎস্য ও পশুপাখির অভিযোজনের উপযোগিতা মূল্যায়ন করতে পারব।

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিরূপ আবহাওয়া-সহিষ্ণু ফসল ও ফসলের জাত

অষ্টম শ্রেণিতে আমরা প্রতিকূল পরিবেশ ও বিরূপ আবহাওয়া সম্পর্কে জেনেছি। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশে বছরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের প্রতিকূল বা বিরূপ আবহাওয়া বিরাজ করে। শীতকালে অতি শৈত্য বা কম শৈত্য পড়া, গ্রীষ্মকালে অতি উচ্চ তাপমাত্রা, খরা, লবণাক্ততা, বন্যা বা জলাবদ্ধতা হলো বাংলাদেশের ফসল উৎপাদনে প্রতিকূল পরিবেশ ও বিরূপ আবহাওয়া। পূর্বপ্রস্তুতি ও যথাযথ ব্যবস্থাপনা না থাকলে এ ধরনের প্রতিকূল পরিবেশ বা বিরূপ আবহাওয়ায় ফসলের ফলন ব্যাপকভাবে হ্রাস পায়। বিরূপ আবহাওয়া বা প্রতিকূল পরিবেশে ফসল উৎপাদনের পূর্বশর্ত হলো উপযোগী ফসল বা ফসলের জাত নির্বাচন। বিভিন্ন ধরনের বিরূপ আবহাওয়া বা প্রতিকূল পরিবেশ-সহিষ্ণু ফসল বা ফসলের জাত রয়েছে। বাংলাদেশের কৃষিবিজ্ঞানীরা ইতোমধ্যে বেশ কিছু ফসলের প্রতিকূল পরিবেশ-সহিষ্ণু নতুন জাত বের করেছেন এবং আরও জাত বের করার জন্য গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। আমরা এখন বিভিন্ন ধরনের প্রতিকূল আবহাওয়া-সহিষ্ণু ফসল বা ফসলের জাত নিয়ে আলোচনা করব।

শীতসহিষ্ণু ফসল

বাংলাদেশে নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত শীতকাল। শীতকালে দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা জানুয়ারি মাসে হয়ে থাকে। শীতকালে সর্বোচ্চ গড় তাপমাত্রা ২৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন গড় তাপমাত্রা ১১ ডিগ্রি সেলসিয়াস হয়ে থাকে। আমাদের দেশে শৈত্য বেশি পড়লে এবং শৈত্যতা দীর্ঘস্থায়ী হলে শীতকালীন ফসল, যেমন–গোলআলু ও গমের ফলন ভালো হয়। তবে রোপা আমন ও বোরো ধানের পরাগায়ণ ও দানা গঠনের সময় শৈত্য বেশি পড়লে অর্থাৎ তাপমাত্রা কমে গেলে চিটা হয়ে ফলন কমে যায়। এ সময় তাপমাত্রা ২০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে গেলে এবং কয়েকদিন এ অবস্থা স্থায়ী হলে ফলন ব্যাপকভাবে হ্রাস পায়। এ জন্য সঠিক সময়ে বীজ বপন ও চারা রোপণ করতে হবে। ব্রি ধান ৩৬ ও ব্রি ধান ৫৫ এ দুটি শৈত্য সহিষ্ণু ধানের জাত। এর মধ্যে ১টি জাতের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হলো :

ব্রি ধান ৫৫ : এ জাতটি ২০১১ সালে অনুমোদন লাভ করে। আগাম ও উচ্চফলনশীল এ জাতের গাছের উচ্চতা ১০০ সেমি। বোরো মৌসুমে হেক্টর প্রতি গড় ফলন ৭ টন এবং আউশ মৌসুমে ৪.৫ টন। বোরো মৌসুমে জাতটি মাঝারি শৈত্য সহ্য করতে পারে বলে দেশের শৈত্য-প্রবণ এলাকায় চাষ করা যায়। তাছাড়া জাতটি মাঝারি লবণাক্ততা এবং খরাও সহ্য করতে পারে। জাতটির জীবনকাল বোরো মৌসুমে ১৪৫ দিন এবং আউশ মৌসুমে ১০০ দিন।

খরাসহিষ্ণু ফসল

আমরা জানি শুষ্ক মৌসুমে একটানা ২০ দিন বা তার অধিক দিন কোনো বৃষ্টিপাত না হলে তাকে খরা বলে। অনাবৃষ্টি বা বৃষ্টিপাতের স্বল্পতার কারণে জমিতে পানির ঘাটতি দেখা যায়। ফলে উদ্ভিদ দেহে প্রয়োজনীয় পানির ঘাটতি দেখা দেয়। এ অবস্থাকে খরা কবলিত বলা হয়। প্রতিবছর দেশে রবি, খরিপ-১ ও খরিপ-২ মৌসুমে ৩০-৪০ লাখ হেক্টর জমি বিভিন্ন মাত্রায় খরার সম্মুখীন হয়। এতে করে খরার তীব্রতা অনুযায়ী ১৫-৯০ ভাগ ফলন ঘাটতি হয়ে থাকে। খরাপ্রবণ এলাকায় ফসল চাষের কলাকৌশল সম্পর্কে আমরা অষ্টম

শ্রেণিতে বিস্তারিত জেনেছি। সেসব কৌশলের মধ্যে অন্যতম কৌশল হলো খরা প্রবণ এলাকায় খরা সহিষ্ণু ফসল বা ফসলের জাত চাষ করা। সাধারণত খরাসহিষ্ণু ফসলের মূল খুব দৃঢ় ও শাখা-প্রশাখাযুক্ত এবং গভীরমূলী হয়। এ সব ফসলের পাতা ছোট, সরু, পুরু বা পেঁচানো হয়ে থাকে। খেজুর, কুল, অড়হর, তরমুজ, অনেক জাতের গম ইত্যাদি খরাসহিষ্ণু ফসল। এখন আমরা প্রধান প্রধান কয়েকটি খরাসহিষ্ণু ফসলের জাত সম্পর্কে আলোচনা করব।

> **কাজ :** শিক্ষার্থীরা খরা ও শৈত্য-সহিষ্ণু ফসলের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো লিখে এবং খরা-সহিষ্ণু ফসল ও ফসলের জাতের তালিকা তৈরি করে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

খরাসহিষ্ণু ধানের জাত

ব্রি ধান ৫৬ ও ব্রি ধান ৫৭ দুইটি খরাসহিষ্ণু ধানের জাত। এর মধ্যে ব্রি ধান ৫৭ এর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হলো :

ব্রি ধান ৫৭ : এ জাতটিও রোপা আমন। গাছের উচ্চতা ১১০-১১৫ সেমি জীবনকাল ১০০-১০৫ দিন। প্রজনন পর্যায়ে সর্বোচ্চ ৮-১৪ দিন বৃষ্টি না হলেও ফলনের তেমন কোনো ক্ষতি হয় না। খরা কবলিত অবস্থায় জাতটি হেক্টরপ্রতি ৩.০-৩.৫ টন এবং খরা না হলে ৪.০-৪.৫ টন ফলন দিতে সক্ষম। ব্রি ধান ৫৬ ও ব্রি ধান ৫৭ এর জীবনকাল কম বলে এরা খরা সহ্যের পাশাপাশি খরা এড়াতেও পারে।

খরাসহিষ্ণু গমের জাত

বারি গম ২০ (গৌরব) ও বারি গম ২৪ (প্রদীপ) দুইটি খরাসহিষ্ণু গমের জাত। এর মধ্যে বারি গম ২৪ এর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হলো :

বারি গম ২৪ (প্রদীপ) : এ জাতটি মধ্যম খাটো, উচ্চ ফলনশীল এবং খরাসহিষ্ণু। এ জাতের পাতা চওড়া, বাঁকানো ও হালকা সবুজ রঙের। জাতটির জীবনকাল ১০২-১১০ দিন এবং ফলন ৪.৩-৫.১ টন/হেক্টর।

ঈশ্বরদী ৩৫ : এ জাতটির ফলন ৯৪ টন/হেক্টর। আখের অন্যান্য খরাসহিষ্ণু জাতের মধ্যে রয়েছে ঈশ্বরদী ৩৩, ঈশ্বরদী ৩৭, ঈশ্বরদী ৩৯ ও ঈশ্বরদী ৪০ ইত্যাদি।

খরাসহিষ্ণু অন্যান্য ফসলের জাত

বারি ছোলা-৫ (পাবনাই) : হালকা সবুজ রঙের এ জাতের গাছের উচ্চতা ৫০ সেমি বীজ ছোট, মসৃণ ও ধূসর বাদামি রঙের, জীবনকাল ১২৮-১৩০ দিনের এবং ফলন ২.৪ টন/হেক্টর হয়ে থাকে। খরাপ্রবণ বরেন্দ্র এলাকায় অক্টোবরের শেষ সপ্তাহ থেকে নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে এ জাতের ছোলা বপন করতে হয়। খরা সহিষ্ণু অন্যান্য জাতের মধ্যে রয়েছে বারি বার্লি-৬, বারি বেগুন-৮, বারি হাইব্রিড টমেটো-৩ ও বারি হাইব্রিড টমেটো-৪, সবজি, মেস্তা ইত্যাদি।

লবণাক্ততা-সহিষ্ণু ফসল

লবণাক্ত মাটি থেকে ফসলের পানি সংগ্রহ করতে অসুবিধা হয়। লবণাক্ততার মাত্রা বেশি হলে ফসল জন্মাতে পারে না। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের উপকূলীয় এলাকার লবণাক্ততার মাত্রা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ জন্য উপকূলীয় এলাকায় লবণাক্ত-সহিষ্ণু ফসল বা ফসলের জাতের আবাদ এলাকা বাড়াতে হবে।

নিচের ছকে লবণাক্ততা সহিষ্ণু ও লবণাক্ততায় সংবেদনশীল কিছু ফসলের তালিকা দেওয়া হলো :

উত্তম লবণাক্ততা-সহিষ্ণু	মধ্যম লবণাক্ততা-সহিষ্ণু	লবণাক্ততা সংবেদনশীল
নারিকেল	মিষ্টি আলু	শিম
সুপারি	গোল আলু	লেবু
তাল	মরিচ	কমলা
বার্লি	বরবটি	গাজর
খেজুর	মুগ	পিঁয়াজ
সুগারবিট	খেসারি	স্ট্রবেরি
শালগম	মটর	মসুর
তুলা	যব	আম
ধৈঞ্চা	ভুট্টা	ডালিম
পালংশাক	টমেটো	
	আমড়া	
	পেয়ারা	

উপকূলীয় লবণাক্ত এলাকায় ধান প্রধান ফসল। ধানের কিছু স্থানীয় ও উন্নত জাত রয়েছে, যারা বিভিন্ন মাত্রার লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে। স্থানীয় জাতের মধ্যে রয়েছে- রাজাশাইল, কাজলশাইল, বাজাইল, কালামানিক, গরচা, গাবুরা ইত্যাদি। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট ইতোমধ্যে বেশ কিছু লবণাক্ততা সহিষ্ণু জাতের ধান বের করেছে। যেমন- ব্রি ধান ৪০, ব্রি ধান ৪১, ব্রি ধান ৪৭, ব্রি ধান ৫৩, ব্রি ধান ৫৪ ও ব্রি ধান ৬৭, ব্রি ধান ৭৮, ব্রি ধান ৯৭, বিনা ধান ৮। এইসব জাতের মধ্যে ২টি প্রধান জাতের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা হলো :

ব্রি ধান ৪৭ : ২০০৬ সালে এ জাতটি লবণাক্তপ্রবণ এলাকায় বোরো মৌসুমে চাষাবাদের জন্য অনুমোদন লাভ করে। এ জাত চারা অবস্থায় বেশি লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে এবং বয়স্ক অবস্থায় নিম্ন হতে মধ্যম মাত্রার লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে। জাতটির গাছের উচ্চতা ১০৫ সেমি জীবনকাল ১৫২ দিন এবং লবণাক্ত পরিবেশে হেক্টরপ্রতি ৬ টন ফলন দিতে সক্ষম।

বিনা ধান ৮ : বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট থেকে ২০১০ সালে লবণাক্ততা সহনশীল এ জাতটি বের হয়। বোরো মৌসুমের এ জাতটির জীবনকাল ১৩০-১৩৫ দিন। লবণাক্ত এলাকায় হেক্টরপ্রতি ফলন ৪.৫-৫.৫ টন। জাতটির বিভিন্ন ধরনের রোগ ও পোকামাকড় প্রতিরোধ ক্ষমতাও রয়েছে।

কাজ : শিক্ষার্থীরা সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় চাষ উপযোগী লবণাক্ততা-সহিষ্ণু ফসল ও ফসলের জাতের তালিকা তৈরি করে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

লবণাক্ততা-সহিষ্ণু অন্যান্য ফসলের জাত

বারি আলু ২২ (সৈকত) : এ জাতের আলুর আকার লম্বাটে গোল এবং লাল রঙের। জাতটির ফলন ২৫-৩০ টন/হেক্টর।

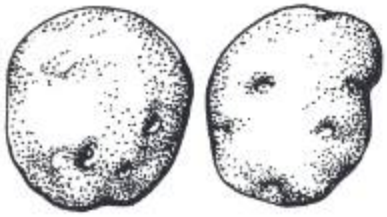

চিত্র : বারি আলু ২২

বারি মিষ্টি আলু-৬ ও ৭ : এ জাত দুটোর আলুর খোসার রং গাঢ় কমলা রঙের, ভিতরটা হালকা কমলা রঙের। আলুতে মধ্যম মাত্রায় ক্যারোটিন এবং শুষ্ক পদার্থের পরিমাণ বেশি থাকে। ফসল সংগ্রহ করতে ১২০-১৩৫ দিন সময় লাগে। জাত দুটি সাধারণ পরিবেশে হেক্টরপ্রতি ৪০-৪৫ টন এবং লবণাক্ত পরিবেশে ১৮-২০ টন ফলন দিতে পারে।

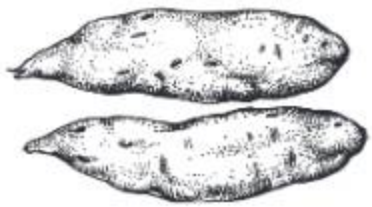

চিত্র : বারি মিষ্টি আলু ৬

বারি সরিষা-১০ : এ জাতের সরিষার গাছ খাটো, উচ্চতা ৮০-১০০ সেমি জীবনকাল ৮৫-৯০ দিন এবং ফলন ১.২-১.৪ টন/হেক্টর। জাতটি লবণাক্ততার পাশাপাশি খরাও সহ্য করতে পারে।

লবণাক্ততা - সহিষ্ণু আখের জাত

ঈশ্বরদী ৩৯ ও ঈশ্বরদী ৪০ এর মধ্যে ঈশ্বরদী ৪০ এর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হলো :

ঈশ্বরদী ৪০ : ঈশ্বরদী ৩৯ জাতের মতো এ জাতটিতেও উচ্চমাত্রায় চিনি পাওয়া যায়। উচ্চ ফলনশীল এ জাতটি দ্রুত বর্ধনশীল ও আগাম পরিপক্বতা গুণসম্পন্ন এবং অঞ্চল ভেদে ফলন ৮৫-৯৫ টন/হেক্টর। এ জাতটিও লবণাক্ততার পাশাপাশি বন্যা ও খরা সহ্য করতে পারে।

চিত্র : ঈশ্বরদী ৪০

বন্যা বা জলাবদ্ধতা-সহিষ্ণু ফসল

বাংলাদেশে প্রতিবছর কমবেশি বন্যা হয়ে থাকে। বন্যাজনিত সাময়িক জলাবদ্ধতা ছাড়াও দেশের কিছু অঞ্চলে স্থায়ী জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়েছে, যেমন–খুলনা ও যশোর জেলার ভবদহ এলাকা। বন্যার কারণে বা অন্য কোনো কারণে সৃষ্ট জলাবদ্ধতা, জলজ উদ্ভিদ ছাড়া বেশিরভাগ উদ্ভিদ সহ্য করতে পারে না।

দেশের বিস্তৃত বন্যাপ্রবণ এলাকার প্রধান ফসল ধান। বন্যাসহিষ্ণু স্থানীয় জাতের গভীর পানির আমন ধানের মধ্যে রয়েছে– বাজাইল ও ফুলকুঁড়ি। বন্যার পানির উচ্চতা বাড়ার সাথে সাথে এ সব জাতের ধান গাছের উচ্চতাও বাড়তে থাকে। এমনকি দিনে ২৫ সেমি পর্যন্ত বাড়তে পারে এবং ৪ মিটার গভীরতায়ও বেঁচে থাকতে পারে। উঁচু জাতের আমন ধানের মধ্যে আছে ব্রি ধান ৪৪। এ জাতের ধান জোয়ার-ভাটা অঞ্চলে ৫০ সেমি উচ্চতার প্লাবন সহ্য করতে পারে।

বন্যাপ্রবণ এলাকার বন্যার পানি নেমে গেলে নাবী জাতের আমন ধান চাষ করে বন্যার ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়া যায়। নাবী জাতের মধ্যে রয়েছে–বিআর ২২ (কিরণ) ও বিআর ২৩ (দিশারি)। কিরণ ও দিশারি জাত দুইটি দেশের বন্যা প্রবণ এলাকায় বন্যার পানি নেমে যাওয়ার পর থেকে ১৫ই আশ্বিন পর্যন্ত রোপণ করা যায়। জোয়ার-ভাটা অঞ্চলে ৪০-৫০ দিনের চারাও রোপণ করা যায়। ফলে উঁচু জোয়ার থেকে ফসল বাঁচে। আমন মৌসুমে এ এলাকায় চাষাবাদের জন্য সম্প্রতি বের হওয়া জাত দুটি হলো– ব্রি ধান ৫১ ও ব্রি ধান ৫২।

ব্রি ধান ৫১ ও ব্রি ধান ৫২ : ঢল বন্যাপ্রবণ এলাকায় আমন মৌসুমে চাষাবাদের জন্য ২০১০ সালে এ জাতটি অনুমোদন লাভ করে। এ জাত দুটির চারা রোপণের এক সপ্তাহ পর ১০-১৪ দিন পানির নিচে ডুবে থাকলেও চারা মরে না বিধায় ফলন কমে না। বন্যামুক্ত পরিবেশে এ জাতের জীবনকাল ১৪০-১৪৫ দিন ও ফলন ৪.৫-৫.০ টন/হেক্টর এবং বন্যাকবলিত হলে জীবনকাল ১৫৫-১৬০ দিন ও ফলন ৪.০-৪.৫ টন/হেক্টর।

জলাবদ্ধতা বা বন্যাসহিষ্ণু অন্যান্য ফসলের জাত

আখের জাত

ঈশ্বরদী ৩২ : বন্যা বা জলাবদ্ধতা-সহিষ্ণু এ জাতটির ফলন হেক্টরপ্রতি ১০৪ টন।

ঈশ্বরদী ৩৮ : এ জাতের আখে উচ্চমাত্রায় চিনি থাকে। জাতটি দ্রুত বর্ধনশীল ও আগাম পরিপক্বতা গুণ সম্পন্ন। জাতটির ফলন ১১৩ টন/হেক্টর এবং উচ্চমাত্রায় বন্যাসহিষ্ণু। এ জাতগুলো ছাড়াও ঈশ্বরদী-৩৪, ঈশ্বরদী-৩৬, ঈশ্বরদী-৩৭, ঈশ্বরদী-৩৯, ঈশ্বরদী-৪০ জাত উঁচু মাত্রায় বন্যা ও জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে।

কেনাফের জাত

বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট থেকে উদ্ভাবিত বিজেআরআই কেনাফ-৩ (বট কেনাফ) জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে। কেনাফ পাটের মতো একধরনের আঁশ ফসল। এ জাতের কেনাফের পাতা অখণ্ড ও বট পাতার ন্যায় এবং ফলন ৩.৫ টন/হেক্টর।

> **কাজ :** শিক্ষার্থীরা বন্যা ও জলাবদ্ধতা-সহিষ্ণু ফসল ও ফসলের জাতের তালিকা তৈরি করে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

নতুন শব্দ : শৈত্য-সহিষ্ণু ফসল, বন্যা বা জলাবদ্ধতা-সহিষ্ণু ফসল

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
জলবায়ু পরিবর্তন ও কৃষিক্ষেত্রে প্রভাব

বাংলাদেশে ফসল উৎপাদনে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব

সৃষ্টির শুরু থেকেই পৃথিবীর জলবায়ু ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়ে প্রাণী ও উদ্ভিদের বসবাস উপযোগী হয়ে ওঠে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের এ ধারা অত্যন্ত ধীর গতিতে অব্যাহত ছিল। কিন্তু বিগত এক শতকে পৃথিবীর অনেক দেশে জলবায়ুর উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে। বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে জলবায়ু পরিবর্তন প্রকৃতিতে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করছে। এ পরিবর্তনের জন্য দায়ী উন্নত বিশ্ব। নগরায়ন, যান্ত্রিক সভ্যতা, কলকারখানার প্রসার, জ্বালানি তেল ও কয়লার যথেচ্ছ ব্যবহার, বৃক্ষনিধন ইত্যাদির কারণে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে গ্রিনহাউস গ্যাসের পরিমাণ বাড়ছে। ফলে বৈশ্বিক তাপমাত্রা বেড়েই চলেছে। বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে আজ বাংলাদেশ বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত ও বিপদাপন্ন দেশ বলে চিহ্নিত হয়েছে। জাতিসংঘের মানব উন্নয়ন রিপোর্টে (২০০৭-০৮) বলা হয়েছে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশের ৭ কোটি মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ভৌগোলিক অবস্থান এবং ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের কারণে বাংলাদেশ আগে থেকেই পৃথিবীর একটি অন্যতম দুর্যোগপ্রবণ দেশ। বর্তমানে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব দুর্যোগের মাত্রাকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) সমীক্ষা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে–

১। বাংলাদেশের গড় বার্ষিক তাপমাত্রা প্রতিবছর একটু একটু করে বৃদ্ধি পেয়েছে।

২। বাংলাদেশের ৮ লাখ ৩০ হাজার হেক্টর জমিতে লবণাক্ততা দেখা দিয়েছে।

৩। বাংলাদেশের গড় বৃষ্টিপাত বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ২০০২, ২০০৩, ২০০৪ ও ২০০৭ সালে বন্যা হয়েছে অর্থাৎ ভয়াবহ বন্যার সংখ্যা বেড়েছে।

৪। বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণিঝড়ের সংখ্যা বেড়েছে।

৫। গ্রীষ্মকালে সমুদ্রের লোনা পানি নদীপথে দেশের অভ্যন্তরে প্রায় ১০০ কিলোমিটার পর্যন্ত প্রবেশ করেছে।

দেশের পরিবেশ ও উৎপাদন প্রেক্ষাপটসমূহ বিবেচনায় জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত ও ঝুঁকিপূর্ণ খাত হচ্ছে কৃষি খাত। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে দেশে বিভিন্ন রকম বিরূপ অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে; যেমন–

১। গ্রীষ্মকালে অতি উচ্চ তাপমাত্রা

২। অনিয়মিত ও অসময়ে বৃষ্টিপাত

৩। অল্প সময়ে অধিক বৃষ্টি এবং তার ফলে জলাবদ্ধতা ও ভূমিধস

৪। শুষ্ক মৌসুমে কম বৃষ্টিপাত

৫। বন্যার ভয়াবহতা ও সংখ্যা বৃদ্ধি

৬। আকস্মিক বন্যা ও খরার ফলে ফসলহানি

৭। অতিরিক্ত ঠান্ডা ও গরম

৮। উপকূলীয় এলাকায় লবণাক্ত জমির পরিমাণ বৃদ্ধি ও ভূমিক্ষয়

৯। ঝড়-জলোচ্ছ্বাসের তীব্রতা ও সংখ্যা বৃদ্ধি

১০। কুয়াশা, শিলাবৃষ্টি ইত্যাদি

কাজ : শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে সৃষ্ট বিভিন্ন ধরনের বিরূপ আবহাওয়ার একটি তালিকা তৈরি করবে।

ফসল উৎপাদনে তাপমাত্রার প্রভাব

আমরা আগেই জেনেছি জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশে গ্রীষ্মকাল ও শীতকালে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। পাশাপাশি গ্রীষ্ম ও শীতকালে তাপমাত্রার হ্রাস-বৃদ্ধির অস্বাভাবিক আচরণ লক্ষ করা যাচ্ছে। কখনো কখনো গ্রীষ্মকালে অতি উচ্চ তাপমাত্রা এবং শীতকালে অত্যাধিক শীত পড়তে দেখা যাচ্ছে। তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে বাংলাদেশে উফশী ধানের ফলন কমে যাবে এবং গমে রোগের আক্রমণ বেড়ে যাবে। এখনকার চেয়ে দেশের তাপমাত্রা ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি পেলে গম চাষ সম্ভব হবে না। আলু ও অন্যান্য শীতকালীন ফসল উৎপাদনে ধস নামবে। ধানের জন্য অসহ্য গরম তাপমাত্রা হলো ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ফুল ফোটার সময় ধানগাছ সবচেয়ে বেশি কাতর। এ সময় তাপমাত্রা ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা তারও বেশি হলে চিটার পরিমাণ বেড়ে যায়। নিম্ন তাপমাত্রার কারণে ধানগাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়, ধানগাছ হলদে বর্ণ ধারণ করে, ধানের চারা দুর্বল হয় এবং ফসলের জীবনকাল বেড়ে যায়।

ফসল উৎপাদনে খরার প্রভাব

বাংলাদেশে ফসল উৎপাদনে খরা অন্যতম একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে যা দিন দিন প্রকট আকার ধারণ করছে। ফসলের বৃদ্ধি পর্যায়ে গড় বৃষ্টিপাতের অভাবে মাটিতে পানি শূন্যতা সৃষ্টি হয়। কম বৃষ্টিপাত ও অধিক হারে মাটি থেকে পানি বাষ্পীভূত হওয়ার ফলে কৃষিক্ষেত্রে খরার প্রভাব দেখা দেয়। দেশে প্রতি বছর ৩০-৪০ লাখ হেক্টর জমি বিভিন্ন মাত্রার খরায় কবলিত হয়ে থাকে। খরাপ্রবণ এলাকায় ফসলের ফলন নির্ভর করে খরার তীব্রতা, খরার স্থিতিকাল এবং ফসলের বৃদ্ধি পর্যায়ের উপর। ফসলে ক্ষতির মাত্রার উপর নির্ভর করে খরাকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন–

১। তীব্র খরা (৭০-৯০ ভাগ ফলন ঘাটতি হয়)
২। মাঝারি খরা (৪০-৭০ ভাগ ফলন ঘাটতি হয়)
৩। সাধারণ খরা (১৫-৪০ ভাগ ফলন ঘাটতি হয়)

কাজ : শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে ফসল উৎপাদনে খরার প্রভাব সম্পর্কে প্রতিবেদন তৈরি করবে ও শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

ফসল উৎপাদন মৌসুমের উপর ভিত্তি করে খরাকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন– রবি খরা, খরিপ-১ খরা ও খরিপ-২ খরা।

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে খরার তীব্রতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, দিনাজপুর, বগুড়া, কুষ্টিয়া, যশোর, ঢাকা ও টাঙ্গাইল জেলার কিছু অংশে তীব্র খরা প্রবণ এলাকা। রংপুর ও বরিশাল জেলা এবং দিনাজপুর, কুষ্টিয়া ও যশোর জেলার কিছু অংশ মাঝারি খরাপ্রবণ এলাকা। তবে বর্তমানে তিস্তা নদীতে পানি প্রবাহ হ্রাস পাওয়ার শুষ্ক মৌসুমে তিস্তা অববাহিকায় খরার তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

খরাতে খাপ খাওয়ানোর কৌশল হিসাবে চাষ পদ্ধতির পরিবর্তন, কম পানি লাগে এমন ফসলের চাষ, জাবড়া প্রয়োগ ইত্যাদি পদ্ধতিকে উৎসাহিত করে উপযোগী ফসলের চাষ করতে হবে। খরাসহিষ্ণু স্থানীয় জাতের উন্নয়ন ও এর আবাদ এলাকা বাড়াতে হবে। খরার কারণে ধান লাগাতে বেশি দেরি হলে নাবি ও খরাসহিষ্ণু জাতের ধান চাষ করতে হবে। আমন ধান কাটার পর খরা সহনশীল ফসল যেমন– ছোলা চাষ, তেল ফসল হিসাবে তিলের চাষ জনপ্রিয় করতে হবে।

ফসল উৎপাদনে লবণাক্ততার প্রভাব

বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের মাটিতে লবণাক্ততার প্রভাব দেখা যায়। ঝড়, জলোচ্ছ্বাস এবং প্রবল জোয়ারের ফলে সৃষ্ট বন্যায় সরাসরি লবণাক্ত পানি দিয়ে জমি ডুবে যাওয়ায় মাটিতে লবণের পরিমাণ বেড়ে যায়। আবার শুষ্ক মৌসুমে পানির বাষ্পীভবনের মাধ্যমে মাটির নিচের লবণ উপরে উঠে আসে। ফলে জমির উর্বরতা নষ্ট হয়। ১৯৭৩ সালে ৮.৩৩ লাখ হেক্টর জমি বিভিন্ন মাত্রার লবণাক্ততায় আক্রান্ত ছিল। ২০০ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১০.২০ লাখ হেক্টরে। বর্তমানে লবণাক্ততায় আক্রান্ত জমির পরিমাণ ১০.৫৬ লাখ হেক্টর। অর্থাৎ প্রায় ১৬.৮৯ লাখ হেক্টর উপকূলীয় জমির ৬২.৫২% বর্তমানে বিভিন্ন মাত্রার লবণাক্ততায় আক্রান্ত। লবণাক্ততার মাত্রার উপর ভিত্তি করে লবণাক্ততা আক্রান্ত মাটিকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়েছে, যথা–

১) খুব সামান্য লবণাক্ততা আক্রান্ত মাটি

২) সামান্য লবণাক্ততা আক্রান্ত মাটি

৩) মধ্যম লবণাক্ততা আক্রান্ত মাটি

৪) তীব্র লবণাক্ততা আক্রান্ত মাটি ও

৫) অতি তীব্র লবণাক্ততা আক্রান্ত মাটি।

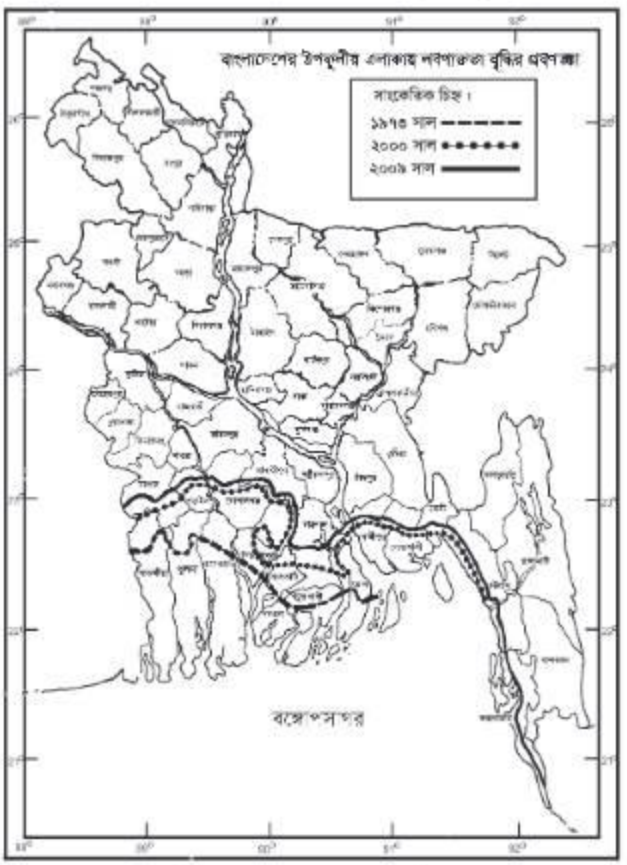

খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, পটুয়াখালী, বরগুনা, বরিশাল, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, যশোর, নড়াইল, গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর জেলার অনেক এলাকা লবণাক্ততায় আক্রান্ত হয়েছে। ফলে এ সব এলাকায় কৃষি উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে তাপমাত্রা বৃদ্ধি ও কম বৃষ্টিপাতের কারণে লবণাক্ততা বৃদ্ধির ধারা আরও বাড়বে। বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে সমুদ্রের উচ্চতা বৃদ্ধি পাওয়ায় নতুন করে অনেক এলাকায় লবণাক্ততা ছড়িয়ে পড়বে। এমনিতেই উপকূলীয় এলাকার প্রায় ৫০% জমি বিভিন্ন মাত্রায় প্লাবিত হওয়ায় সঠিকভাবে ব্যবহার করা যায় না। তদুপরি উপকূলীয় এলাকায় লবণাক্ততা বৃদ্ধি পাওয়ায় ফসল চাষ আরও হুমকির মুখে পড়বে।

কাজ : শিক্ষার্থীরা জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে বাংলাদেশে লবণাক্ততা বৃদ্ধির প্রবণতা মানচিত্রে প্রদর্শন করবে।

এমতাবস্থায় লবণাক্ততা সহনশীল ফসল এবং ফসলের জাতের চাষ উপকূলীয় এলাকায় জনপ্রিয় করতে হবে। লবণাক্ত-সহিষ্ণু স্থানীয় জাতের উন্নয়ন ঘটাতে হবে। লবণাক্ত এলাকায় চাষের জন্য বিভিন্ন ধরনের কৃষিতাত্ত্বিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। আমন মৌসুমে বিআর ২৩, ব্রি ধান ৪০, ব্রি ধান ৪১ এবং বোরো মৌসুমে ব্রি ধান ৪৭, ব্রি ধান ৫৪, ব্রি ধান - ৯৯ লবণাক্ততা সহনশীল ধান এবং খরাসহিষ্ণু জাত ব্রি ধান ৭১,বিনা ধান ৮ জাতের চাষ করতে হবে।

ফসল উৎপাদনে জলাবদ্ধতা বা বন্যার প্রভাব

প্রতিবছর দেশের প্রায় ২৫% জমি বন্যার কারণে বিভিন্ন মাত্রায় প্লাবিত হয়। মে থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত সময়ে এ দেশে বন্যা হয়ে থাকে। দেশের মোট উৎপাদিত দানা শস্যের ৬০ ভাগের বেশি এ সময় উৎপাদন হয়। ঘন ঘন বন্যার কারণে কৃষকেরা স্থানীয় জাতের আমন ধান চাষে বাধ্য হয়ে পড়ে, কারণ এসব জাত গভীর পানিতে জন্মাতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বন্যার তীব্রতা, স্থায়িত্ব ও ঘনত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে।

ঝড়-জলোচ্ছ্বাসজনিত বন্যা উপকূলীয় এলাকায় ব্যাপক ক্ষতি করে। জমিতে লবণাক্ত পানির জলাবদ্ধতা সৃষ্টি করে। ফলে জলাবদ্ধতা ও লবণাক্ততার কারণে ফসল চাষের অনুপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করে। কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, সুনামগঞ্জ, সিলেট, নেত্রকোনা, নীলফামারী ইত্যাদি জেলা ঢল বন্যার শিকার হয়। প্রায় প্রতিবছর এ সব অঞ্চলের হাজার হাজার একর জমির পাকা বোরো ধান কর্তনের আগেই ঢল বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রায় চার হাজার বর্গকিলোমিটার ও দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের এক হাজার চারশত বর্গকিলোমিটার এলাকা এ ধরনের ঢল বন্যাপ্রবণ।

বন্যার পানি নিয়ন্ত্রণ ও সমুদ্রের লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশ ঠেকাতে আরও বেশি বাঁধ, স্লুইস গেট নির্মাণের প্রয়োজন দেখা দেবে। এগুলো নির্মাণের ক্ষেত্রে পরিবেশগত দিক ভালোভাবে যাচাই করে নিতে হবে। কোনো রকম ভুল হলে দীর্ঘদিন তার মাশুল দিতে হবে। যশোর ও খুলনা জেলার ভবদহ এলাকা জলাবদ্ধতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

খাপ খাওয়ানোর কৌশল হিসাবে ঢল বন্যাপ্রবণ এলাকায় প্রচলিত ফসলের জাতের চেয়ে আগাম পাকে এমন জাতের ফসল চাষ করতে হবে। ব্রি ধান ২৮, ব্রি ধান ৪৫ চাষ করলে ব্রি ধান ২৯ এর থেকে আগে পাকে। দেশের মধ্যাঞ্চলে বন্যা পরবর্তী সময়ে নাবী জাতের ধান, যেমন– নাইজারশাইল, বিআর ২২, বিআর ২৩ এবং ব্রি ধান ৪৬ চাষ করতে হবে। বন্যার কারণে বীজতলা তৈরির জমি না পেলে দাপোগ পদ্ধতির বীজতলা তৈরি করতে হবে। বন্যা-পরবর্তী সময় দ্রুত শাকসবজি ও অন্যান্য ফসল চাষের জন্য কৃষকদের কৃষি উপকরণ সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।

> **কাজ :** শিক্ষার্থীরা জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বন্যা ও জলাবদ্ধতার প্রভাব বিষয়ে আলোচনা করবে এবং খাতায় লিখে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

নতুন শব্দ : তীব্র খরা, সাধারণ খরা, রবি খরা, খরিপ-১ খরা, খরিপ-২ খরা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে অভিযোজন কলাকৌশল

ফসলের অভিযোজন কলাকৌশল

আমরা জানি প্রতিকূল পরিবেশে উদ্ভিদ বেঁচে থাকার জন্য বিভিন্ন ধরনের শারীরবৃত্তীয় ও জৈব-রাসায়নিক পরিবর্তনের মাধ্যমে খাপ খাইয়ে নেয়। এ খাপ খাইয়ে নেওয়ার কৌশলকে অভিযোজন বলে। ফসলের অভিযোজন কৌশলের জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে কৃষিবিজ্ঞানীরা প্রতিকূল পরিবেশে চাষযোগ্য বিভিন্ন ধরনের ফসলের জাত উদ্ভাবন করছেন। এ পরিচ্ছেদে আমরা খরা, লবণাক্ততা, জলাবদ্ধতা বা বন্যা ইত্যাদি প্রতিকূল বা বিরূপ পরিবেশে ফসলের অভিযোজন কৌশল সম্পর্কে আলোচনা করব।

ফসলের খরা অভিযোজন কৌশল

খরা সম্পর্কে আমরা আগেই জেনেছি। খরা অবস্থায় ফসলের জন্য মাটিতে প্রয়োজনীয় রসের ঘাটতি থাকে, বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কম থাকে, তাপমাত্রা বেশি ও সূর্যালোক প্রখর থাকে। এ অবস্থায় ফসল খরা এড়ানো ও খরা প্রতিরোধ করার মাধ্যমে টিকে থাকে।

১। খরা এড়ানো

খরা অবস্থায় ফসলের অভিযোজনের সবচেয়ে সহজ উপায় হলো খরা অবস্থাকে এড়িয়ে যাওয়া। বৃষ্টিপাত শুরু হওয়া ও খরা অবস্থা শুরু হওয়ার মধ্যবর্তী সময়ে জীবনচক্র শেষ করে খরা কবলিত না হওয়ার কৌশলকে খরা এড়ানো বলে।

আবাদকৃত ফসলের মধ্যে কিছু কিছু জাতের ফসল রয়েছে যাদের জীবনকাল স্বল্প। কোনো কোনো ফসলের আগাম জাত অল্প সময়ে পরিপক্বতার কারণে দুই-একটি খরা এড়াতে পারে। ফসলের ফুল, ফল ধারণ ও পরিপক্বতার কাল স্বল্প হলে খরা এড়াতে পারে। যেমন– ফেলনের ফুল ফোটা হতে দানা পরিপক্ব হতে ১৭-২০ দিন সময় লাগে। ফলে খরাপ্রবণ এলাকায় ফেলন চাষ করে খরা শুরু হওয়ার পূর্বেই ফসল তোলা সম্ভব।

২। খরা প্রতিরোধ

খরাকবলিত অবস্থায় ফসলের টিকে থাকার কৌশলকে খরা প্রতিরোধ বলে। ফসলের খরা প্রতিরোধ কৌশলকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা হয়, যথা- ক) খরা সহ্যকরণও খ) খরা পরিহারকরণ। আমরা এখন খরা সহ্যকরণ কৌশল নিয়ে আলোচনা করব।

ক) ফসলের খরা সহ্যকরণ কৌশল

ফসল খরায় পতিত হওয়ার পরও দেহাভ্যন্তরের স্বল্প পানি সাম্যতা নিয়ে টিকে থাকার ক্ষমতাকে খরা সহ্যকরণ বলে। এ সব ফসল খরা অবস্থা চলে গেলে পুনরায় স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও ফুল-ফল ধারণ করে। ফসলের খরা সহ্যকরণ কৌশলগুলো নিচে আলোচনা করা হলো :

১। **কোষের পানিশূন্যতা রোধকরণ :** এ ধরনের ফসল খরা অবস্থায় কোষের মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণ দ্রাব জমিয়ে রাখে। ফলে কোষাভ্যন্তরে উচ্চতর অভিস্রবণ চাপ বজায় থাকে। কোষ থেকে পানি শুকিয়ে যায় না এবং কোষ চুপসে যায় না। খরার সময় তুলা ফসলে এটা লক্ষ করা যায়।

২। **মোটা কোষ প্রাচীর :** অনেক ফসলে পাতার কোষে পানির পরিমাণ কমে গেলেও কোষ প্রাচীর মোটা হওয়ার কারণে পাতা নেতিয়ে পড়ে না।

৩। **উপোসকরণ :** কিছু কিছু উদ্ভিদ খরা কবলিত অবস্থায় সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার হার কমিয়ে দেয়। এ অবস্থায় পাতার কোষ নেতিয়ে পড়লেও রক্ষী কোষ বিভিন্ন প্রকার দ্রাব জমিয়ে রেখে রসস্ফীতি চাপ বজায় রাখে এবং স্বল্প মাত্রায় কার্বন ডাই-অক্সাইড প্রবেশ করিয়ে সীমিত পর্যায়ের সালোকসংশ্লেষণ বজায় রাখে। এভাবে খরাকালীন অবস্থায় উদ্ভিদ কোনো রকমে বেঁচে থাকে।

৪। **প্রোটিন ও প্রোলিন জমাকরণ :** খরার প্রভাবে উদ্ভিদ দেহের প্রোটিন ভেঙে বিভিন্ন জৈব-রাসায়নিক কর্মকাণ্ডে ব্যবহৃত হয়। উদ্ভিদ দেহে প্রোটিন বেশি মজুদ থাকলে তা খরা প্রতিরোধে সাহায্য করে। আবার প্রোটিন ভেঙে নানা রকম বিষাক্ত দ্রব্য উৎপন্ন হতে পারে। এ জন্য কিছু কিছু উদ্ভিদ প্রোলিন নামক এক ধরনের রাসায়নিক দ্রব্য তৈরি করে যা এ বিষাক্ততার মাত্রাকে কমিয়ে ফসলকে খরা সহনশীল করে তোলে।

৫। **কোষ গহ্বর শূন্যতা :** উদ্ভিদের অঙ্গ ভেদে খরা সহ্য করার সামর্থ্যে পার্থক্য দেখা যায়। উদ্ভিদের যে সব অঙ্গে কোনো কোষ গহ্বর থাকে না, সে সব অঙ্গ খরা সহনশীল হয়। যেমন– খরার কারণে কোনো কোনো উদ্ভিদের পাতা মরে গেলেও পত্র মুকুল মরে না। পত্র মুকুল খরা সহ্য করে এবং খরার অবসান হলে বৃদ্ধি পেতে থাকে।

৬। **সুপ্তাবস্থা :** অনেক বহুবর্ষী উদ্ভিদের খরা অবস্থায় মাটির উপরের অংশ মরে যায় কিন্তু মাটির নিচে কন্দ/বাল্ব/রাইজোম ইত্যাদি আকারে সুপ্তাবস্থায় বেঁচে থাকে। অনুকূল পরিবেশে এগুলো অঙ্কুরিত হয়।

খ) ফসলের খরা পরিহারকরণ কৌশল

আমরা আগেই জেনেছি ফসলের খরা প্রতিরোধের কৌশল দুইটি, যথা– খরা সহ্যকরণ ও খরা পরিহারকরণ। নিচে ফসলের প্রধান প্রধান খরা পরিহারকরণ কৌশলগুলো বর্ণনা করা হলো :

১। **পত্ররন্ধ্র নিয়ন্ত্রণ :** অনেক ফসল পত্ররন্ধ্র খোলা ও বন্ধ হওয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে প্রস্বেদন প্রক্রিয়ায় পানির অপচয় হ্রাস করে খরা অবস্থা মোকাবিলা করে। যেমন–যব ও লম্বা জাতের অনেক গম ফসল সকালের দিকে অল্প সময়ের জন্য পত্ররন্ধ্র খোলা রাখে এবং দিনের বাকি সময় পত্ররন্ধ্র বন্ধ রাখে। আবার অনেক ফসলের কোষে পানি ঘাটতি হলে এবং পরিবেশের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে পত্ররন্ধ্রের আকার কমিয়ে দেয়, পত্ররন্ধ্র বন্ধ করে দেয়। শিমের অধিকাংশ জাত এভাবে খরা পরিহার করে। আবার অনেক ফসলের পাতায় পত্ররন্ধ্রের সংখ্যা কম থাকে, পত্ররন্ধ্র পাতার ছোট ছোট ভাঁজ বা গর্তের মধ্যে থাকে। ফলে প্রস্বেদন কম হয়, পানি সংরক্ষিত থাকে।

২। **প্রস্বেদন নিয়ন্ত্রণ :** অনেক ফসল খরায় পতিত হলে পাতার উপর লিপিড জমা করে প্রস্বেদন হারকে কমিয়ে দেয়; যেমন– সয়াবিন ফসল। আবার অনেক ফসল পাতার উপরে মোম বা ঘন রোমের আচ্ছাদন সৃষ্টি করে প্রস্বেদন হ্রাস করে।

৩। **পাতার আকার হ্রাসকরণ :** অনেক ফসল খরাকবলিত অবস্থায় পাতার আকার হ্রাস করে প্রস্বেদন কমিয়ে দেয়; যেমন– ফেলন। পাতার কিনারা বা পাতার অগ্রভাগ পুড়িয়ে অনেক উদ্ভিদ পাতার আকার হ্রাস করে।

৪। **পাতা ঝরানো :** খরার মাত্রা বৃদ্ধি পেলে অনেক ফসল নিচ থেকে পুরাতন পাতা ঝরিয়ে প্রস্বেদন হ্রাস করে। তুলা, চিনাবাদাম, জোয়ার ও ফেলনের এ ধরনের প্রবণতা দেখা যায়। খরার অবসান হলে এ ধরনের ফসলে কাণ্ডের শীর্ষ বা পাতার কক্ষ থেকে পুনরায় কুশি গজায়। খরার ফলে ইথিলিন (এনজাইম) উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় এ ধরনের ঘটনা ঘটে।

৫। **সালোকসংশ্লেষণ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ :** কিছু ফসল পত্ররন্ধ্র নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে প্রস্বেদন কমালেও পত্ররন্ধ্রের সাহায্যে খুব কম পরিমাণ কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে বেশি পরিমাণ খাদ্য তৈরি করে। ভুট্টা, আখ ইত্যাদি ফসলে এটা দেখা যায়।

৬। **দক্ষ মূলতন্ত্র :** কিছু কিছু উদ্ভিদ মূলের দৈর্ঘ্য, সংখ্যা ও ঘনত্ব বাড়িয়ে অধিক পরিমাণ পানি আহরণের মাধ্যমে খরা অবস্থা মোকাবিলা করে; যেমন– ভুট্টা, তুলা ও গমের অনেক জাতে এ ধরনের প্রবণতা দেখা যায়। মূলের অধিক গভীরতা ও ঘনত্ব একই ফসলে বিরাজমান থাকলে সে ফসল অধিক খরা প্রতিরোধী হয়; যেমন– জোয়ার ও বাজরা। আবার ধইনচা, তুলা, অড়হর গভীরমূলী হওয়ায় খরা প্রতিরোধী হয়।

৭। **পাতা মোড়ানো ও পাতা কুঞ্চিতকরণ :** অনেক দানা ফসল; যেমন– জোয়ার, কাউন পাতার আকার হ্রাসকরণ ছাড়াও খরা পরিবেশে পাতা কুঞ্চিত করে। আবার অনেক ফসল পাতা মুড়িয়ে সূর্যালোক প্রাপ্তির আয়তন কমিয়ে দেয়। ফলে এদের প্রস্বেদন কমে যাওয়ার কারণে পানির অপচয় হ্রাস পায় এবং খরা পরিবেশে খাপ খাইয়ে নেয়।

৮। **পাতার দিক পরিবর্তন :** অনেক উদ্ভিদে খরা অবস্থায় সূর্যালোকের সাথে বা খাড়াভাবে পাতার দিক পরিবর্তন করে। ফলে প্রস্বেদনের হার হ্রাস পেয়ে পানি সাশ্রয় হয়। চিনাবাদাম, তুলা ও ফেলনসহ আরও অনেক দ্বি-বীজপত্রী উদ্ভিদ এ প্রক্রিয়ায় খরা প্রতিরোধ করে।

কাজ : শিক্ষার্থীরা ফসলের খরা অভিযোজন কৌশলগুলো খাতায় লিখে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

ফসলের লবণাক্ততা অভিযোজন কলাকৌশল

অষ্টম শ্রেণিতে আমরা লবণাক্ত পরিবেশে ফসল উৎপাদন কলাকৌশল সম্পর্কে জেনেছি। লবণাক্ততার প্রতি সাড়া প্রদানের উপর ভিত্তি করে ফসলকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়; ক) হ্যালোফাইটস– গোলপাতা, কেওড়া ও খ) গ্লাইকোফাইটস– সুগারবিট, শিম, তুলা। হ্যালোফাইটস জাতীয় উদ্ভিদ লবণাক্ত পরিবেশে অঙ্কুরিত হয়ে, সেখানেই জীবনচক্র সম্পন্ন করতে পারে যা গ্লাইকোফাইটস পারে না।

লবণাক্ত এলাকার মৃত্তিকা পানিতে অতিরিক্ত সোডিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ইত্যাদির ক্যালসিয়াম ও সালফেট লবণ দ্রবীভূত থাকায় পানির ঘনত্ব বেশি থাকে। এ পরিবেশে উদ্ভিদকে টিকে থাকতে হলে উদ্ভিদের কোষ রসের ঘনত্ব মৃত্তিকা পানির ঘনত্ব থেকে বেশি হতে হয়। বেশি না হলে উদ্ভিদ মাটি থেকে পানি বা খাদ্যোপাদান শোষণ করতে পারে না, উল্টা পানি হারিয়ে নেতিয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় উদ্ভিদ কোষের রসস্ফীতি বজায় রাখার জন্য মাটি হতে বিভিন্ন প্রকার আয়ন (K^+, Na^+) আহরণ করে লবণাক্ততার এ বাধা অতিক্রম করে। এতে করে উদ্ভিদের দেহাভ্যন্তরে আয়নের আধিক্য ঘটে। কিন্তু লবণ সহ্যকারী উদ্ভিদ আয়নের আহরণকে নিয়ন্ত্রণ করে। কোনো কোনো প্রজাতির পাতায় একধরনের লবণ জালিকা থাকে যার মাধ্যমে অতিরিক্ত আয়ন বের করে দিতে পারে। আবার কোনো কোনো প্রজাতি পাতার আয়তন বাড়িয়ে শরীরে লবণের ঘনত্ব কমিয়ে নেয়। কোনো কোনো প্রজাতিতে পাতার কোষে অতিরিক্ত আয়ন জমিয়ে রাখার বিশেষ ব্যবস্থা থাকে।

কিছু কিছু উদ্ভিদ আছে যারা লবণাক্ত পরিবেশে আয়ন আহরণ না করে অন্য উপায় অবলম্বন করে। এসব উদ্ভিদের মূলের কোষের রসস্ফীতি বজায় রাখার জন্য কোষ গহ্বরে বিভিন্ন প্রকার জৈব দ্রাব জমা করে রাখে। এ ধরনের উদ্ভিদের কোষ গহ্বরের আয়তন কোষের মোট আয়তনের ৯৫% হয়ে থাকে। কোষ গহ্বরে জমা করা জৈব দ্রব্যের মধ্যে সালোক-সংশ্লেষণজাত দ্রব্যই বেশি থাকে।

জলাবদ্ধ অবস্থায় বা বন্যায় ফসলের অভিযোজন কলাকৌশল

জলজ উদ্ভিদ ছাড়া অধিকাংশ ফসল বন্যা বা জলাবদ্ধ বা মৃত্তিকা পানির সম্পৃক্ত অবস্থায় বেঁচে থাকতে পারে না। এ অবস্থায় মাটিতে অক্সিজেনের অভাবে উদ্ভিদের মূল শ্বসনকাজ চালাতে পারে না। যত দ্রুত মাটি বা পানিস্থ দ্রবীভূত অক্সিজেন শেষ হয়ে যায় এ সব উদ্ভিদ তত দ্রুত মারা যায়। ধান পানি পছন্দকারী উদ্ভিদ। ধান গাছে এ্যারেনকাইমা টিস্যু থাকে। এ টিস্যুর মধ্যে প্রচুর বায়ু কুঠুরি থাকে। বায়ু কুঠুরিতে অক্সিজেন জমা থাকে। ফলে ধানগাছ ডুবে না গেলে বন্যা বা জলাবদ্ধ অবস্থায় বেঁচে থাকে এবং ভালো ফলন দেয়। তবে অনেক দিন ডুবে থাকলে মারা যায়। গভীর পানির আমন ধান বন্যার পানি বাড়ার সাথে সাথে উচ্চতায় বাড়তে থাকে। এসব জাতের ধানগাছের পর্ব মধ্যে এক ধরনের ভাজক কলা থাকে যা বন্যার পানি বাড়ার সাথে সাথে দ্রুত বিভাজিত হয়ে গাছের দৈহিক বৃদ্ধি ঘটিয়ে বন্যা মোকাবিলা করে। আবার লম্বা জাতের ধান উচ্চতার কারণে বন্যা এড়াতে পারে।

উচ্চ তাপমাত্রা অভিযোজন কৌশল

উচ্চ তাপমাত্রায় ফসলের সালোকসংশ্লেষণ ও শ্বসনের হার কমে যায়। শ্বসনের তুলনায় সালোকসংশ্লেষণের হার বেশি কমে। এ অবস্থায় ফসলের প্রোটিন ভেঙে যায়, পানির অপচয় হয়। তাপ সহনশীল উদ্ভিদে উচ্চ তাপমাত্রায় বিশেষ ধরনের স্থিতিশীল প্রোটিন সৃষ্টি হয়। তাপ সহনশীল উদ্ভিদ দেহ থেকে ভেঙে যাওয়া প্রোটিনকে সরিয়ে দিতে পারে।

কাজ : শিক্ষার্থীরা লবণাক্ততা, জলাবদ্ধতা এবং উচ্চ তাপমাত্রায় ফসলের অভিযোজন কৌশল সম্পর্কে খাতায় লিখে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

নতুন শব্দ : খরা এড়ানো, খরা প্রতিরোধ, খরা সহ্যকরণ, প্রোলিন, হ্যালোফাইটস, এ্যারেনকাইমা টিস্যু

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
মৎস্য ক্ষেত্রের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব

পুষ্টির চাহিদা পূরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন তথা বাংলাদেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে মৎস্য খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। অভ্যন্তরীণ জলাশয় থেকে মৎস্য আহরণে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বে তৃতীয়। আর মাছ চাষের ক্ষেত্রে এদেশের অবস্থান পঞ্চম। এদেশের নদী-নালা, খাল-বিল, হাওর, পুকুর, দিঘি, প্লাবন ভূমি ইত্যাদি অভ্যন্তরীণ মুক্ত ও বদ্ধ জলাশয়ের মোট পরিমাণ হচ্ছে প্রায় ৪.৭ মিলিয়ন হেক্টর। সেই সাথে আরও রয়েছে ১ লক্ষ ৬৬ হাজার বর্গকিলোমিটারের বিশাল সামুদ্রিক এলাকা। দেশের এই সকল জলভাগ থেকে বর্তমানে যে মৎস্য উৎপাদন হয় তা এদের আয়তনের তুলনায় যথেষ্ট নয়। এ থেকে আরও অনেক বেশি উৎপাদন সম্ভব। বাংলাদেশে ২০১১-১২ সালে যেখানে মাছের উৎপাদন ছিল প্রায় ৩২.৬২ লক্ষ মেট্রিক টন। সেখানে সরকারের রূপকল্প ২০২১ অনুযায়ী ২০২০-২০২১ সাল নাগাদ মৎস্য উৎপাদনের লক্ষ মাত্রা ধরা হয়েছে ৪৫.৫০ লক্ষ মেট্রিক টন। যদিও দেশে মাছের উৎপাদন বিগত

বছরগুলোতে ক্রমান্বয়ে বেড়েছে। কিন্তু এটি বেড়েছে মাছ চাষ বৃদ্ধির ফলে। অথচ অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয় যেমন-নদী, খাল, বিল, হাওর প্লাবনভূমিতে প্রাকৃতিকভাবে মাছের উৎপাদন আশঙ্কাজনকভাবে হ্রাস পেয়েছে। সেখানে কমে যাচ্ছে মাছের জীববৈচিত্র্যও। আর এর অন্যতম কারণ হচ্ছে জলবায়ুর পরিবর্তন। জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে পরিবেশের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে যাচ্ছে, লবণাক্ততা বৃদ্ধি পাচ্ছে, অনাবৃষ্টি বা অপর্যাপ্ত বৃষ্টি হচ্ছে। বেড়ে যাচ্ছে সাইক্লোন ও জলোচ্ছ্বাসের তীব্রতা ও সংখ্যা। এ সমস্ত কারণে মাছ চাষ, মাছের স্বাভাবিক প্রজনন ও বিচরণ ব্যাহত হচ্ছে। নিচে মৎস্য ক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব আলোচনা করা হলো-

ক) মাছ চাষ ও পোনা উৎপাদনে প্রভাব

১) আমাদের দেশে মৌসুমি পুকুরগুলোতে এপ্রিল-মে মাসে বৃষ্টির পানি জমলে চাষিরা মাছ ছাড়ে। জলবায়ুর পরিবর্তনের কারণে বৃষ্টিপাত কমে গেছে। অথবা বৃষ্টিপাত শুরু হতে দেরি হচ্ছে। এতে করে পোনা ছাড়তে দেরি হচ্ছে। আবার দেরিতে পোনা ছাড়ার পর পুকুর শুকিয়েও যাচ্ছে তাড়াতাড়ি। ফলে চাষের সময় কমে যাচ্ছে এবং মাছ বড় হওয়ার আগেই ছোট মাছ বাজারজাত করতে হচ্ছে। এতে করে চাষিরা লোকসানের সম্মুখীন হচ্ছে।

২) জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে তাপমাত্রা বৃদ্ধি ও কম বৃষ্টিপাতের ফলে হ্যাচারিতে মাছের প্রজনন ও পোনা উৎপাদন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। প্রজননের অনুকূল পরিবেশ না পাওয়া ও তাপমাত্রা বেশি থাকার কারণে হ্যাচারিতে মাছ কৃত্রিম প্রজননে সাড়া দিচ্ছে না। পেটে ডিম আসলেও ডিম ছাড়ছে না। ডিম শরীরে শোষিত হয়ে যাচ্ছে। আবার মাছ ডিম ছাড়লেও তা নিষিক্ত হচ্ছে না বা কম হচ্ছে। আবার নিষিক্ত হওয়া ডিমফোটার হারও কম হচ্ছে। জলবায়ুর পরিবর্তন এভাবে হ্যাচারিতে পোনা উৎপাদন ব্যাহত করছে।

৩) স্বল্প গভীর পুকুরে অধিক তাপমাত্রায় মাছ সহজে রোগাক্রান্ত হচ্ছে এবং মৃত্যুহার বেড়ে যাচ্ছে। ফলে উৎপাদন কম হচ্ছে ও চাষিদের আয় কমে যাচ্ছে।

৪) কম বৃষ্টির কারণে চাষের পুকুরে কম পানি পাওয়া যাচ্ছে। ফলে পুকুরে বা খামারে পানি সরবরাহে চাষিকে অতিরিক্ত খরচ করতে হচ্ছে।

৫) জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বন্যা, সাইক্লোন, জলোচ্ছ্বাসের তীব্রতা এবং সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। ফলে মৎস্য সেক্টরে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বেড়ে গিয়ে চাষিদের দুর্ভোগ বাড়ছে। পুকুর থেকে মাছ বেরিয়ে যাচ্ছে।

৬) সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে উপকূলীয় অঞ্চলের চাষের পুকুরগুলো ডুবে যেতে পারে।

খ) অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য উৎপাদনে প্রভাব

১) কম বৃষ্টিপাতের ফলে নদীতে কম পানি হচ্ছে ফলে অল্প পানিতে সহজেই মাছ ধরা সম্ভব হচ্ছে। এতে করে ছোট-বড়, প্রজননক্ষম সব মাছ ধরা পড়ছে। ফলে নদীতে মাছের জীববৈচিত্র্য ও স্থায়ী উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে।

২) তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে যাচ্ছে ফলে লবণাক্ততা ঢুকে পড়ছে মূল ভূ-খণ্ডের দিকে। এতে করে উপকূলীয় এলাকার স্বাদুপানির মাছের প্রাকৃতিক প্রজনন ও বিচরণক্ষেত্র কমে যাচ্ছে। সেই সাথে কমে যাচ্ছে উৎপাদনও।

৩) আমাদের দেশে বিল, বাঁওড়, প্লাবন ভূমিতে এপ্রিল-মে মাস হচ্ছে দেশীয় জাতের ছোট মাছের প্রজননকাল। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বর্ষাকালে বৃষ্টিপাত না হওয়ায় বা কম হওয়ার কারণে জুলাই মাস পর্যন্তও এসব জলাশয়ে পানি হচ্ছে না। ফলে এসব মাছের প্রজনন চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ফলে এর প্রভাব পড়ছে সমগ্র মৎস্য উৎপাদনে এবং যারা মাছ আহরণ করে তাদের পুষ্টি ও জীবীকার ক্ষেত্রে।

৪) আমাদের দেশে একমাত্র হালদা নদীতে প্রাকৃতিকভাবে রুই জাতীয় মাছ ডিম ছাড়ে। বৈশাখ মাসে প্রচণ্ড গরমের পর ভারী বৃষ্টি শুরু হলে এরা ডিম ছাড়ে। তখন নদী থেকে জেলেরা নিষিক্ত ডিম সংগ্রহ করে এবং এই ডিম ফুটিয়ে পোনা উৎপাদন করে। জলবায়ুর পরিবর্তনে তাপমাত্রার বৃদ্ধির ফলে ব্রুডমাছের ডিমের পরিপক্বতা এগিয়ে আসছে। অন্যদিকে বৃষ্টিপাত শুরু হওয়ার সময় দিন দিন পিছিয়ে যাচ্ছে। এতে করে মাছের শারীরবৃত্তীয় অবস্থার সাথে বৃষ্টিপাতের সময়ের অমিল হচ্ছে। ফলে ডিম পাওয়ার সম্ভাবনা কমে আসছে।

গ) সামুদ্রিক মৎস্য ক্ষেত্রে প্রভাব

১) বায়ুমণ্ডলে দিন দিন কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বাড়ছে ফলে বেড়ে যাচ্ছে বাতাসের ও সমুদ্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রা। ফলে বাতাসের গতি প্রকৃতি বদলে যাচ্ছে, বৃষ্টির ধরন পরিবর্তন হচ্ছে। এতে করে সাগরে মাছের বিচরণ ও উৎপাদশীলতায় প্রভাব পড়ছে। ফলে সমুদ্রের কোনো অংশে মাছের পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে পারে। আবার মাছের নিরাপদ বিচরণক্ষেত্র বলে খ্যাত কিছু এলাকা মাছশূন্য হয়ে যেতে পারে।

২) বিশ্বের তাপমাত্রা বৃদ্ধি ও জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে মাছ উষ্ণ মণ্ডলীয় অঞ্চল থেকে মেরু অঞ্চলের সাগরের দিকে সরে যাচ্ছে। অনেক মাছ তার অভিপ্রায়ন (Migration) পথ, প্রজননক্ষেত্র এবং বিচরণক্ষেত্র পরিবর্তন করে ফেলছে। ফলে জেলেরা সুদূর অতীত থেকে যে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে সমুদ্রের যে সব সামুদ্রিক এলাকায় মাছ আহরণ করতে যেত, সেগুলোর পরিবর্তন হলে জেলেরা বিপাকে পড়বে।

৩) কোরাল রীফ বা প্রবাল সামুদ্রিক মাছের উৎকৃষ্ট আবাসস্থল, যেখানে বিভিন্ন ধরনের মাছ বাস করে এবং প্রজনন ক্ষেত্র হিসাবে ব্যবহার করে। পানির তাপমাত্রা বৃদ্ধি, ঢেউয়ের তারতম্য, সমুদ্রের অম্লত্ব বৃদ্ধি, দূষণ, স্রোতের গতি পরিবর্তন ইত্যাদি কারণে প্রবাল ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। এর ফলে সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য তথা মৎস্য বৈচিত্র্যের উপর অত্যন্ত নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

কাজ : শিক্ষার্থীরা মৎস্য ক্ষেত্রের উপর জলবায়ুর প্রভাব সম্পর্কে প্রতিবেদন লিখবে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে মৎস্য ক্ষেত্রে অভিযোজন কলাকৌশল

জলবায়ু পরিবর্তন মৎস্য জীববৈচিত্র্য ও উৎপাদনে যে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে তা কাটিয়ে ওঠা জরুরি। অন্যথায় একদিকে যেমন পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হবে, অন্যদিকে আমাদের খাদ্য নিরাপত্তা মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন হবে। জলবায়ুর পরিবর্তনের এই নেতিবাচক প্রভাব কাটিয়ে ওঠার জন্য পরিবর্তিত পরিবেশের সাথে খাপ-খাইয়ে চলার উদ্যোগ নিতে হবে। এ উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত অভিযোজন কৌশল অবলম্বন করা যেতে পারে -

১। জলবায়ু পরিবর্তনে যেহেতু উপকূলীয় অঞ্চলে লবণাক্ততা বেড়ে যাচ্ছে তাই লবণাক্ততা সহনশীল মাছের চাষ এবং পোনা উৎপাদনের উদ্যোগ নিতে হবে। যেমন-ভেটকি, বাটা, পারশে ইত্যাদি।

২। লবণাক্ততা বেড়ে চলছে এমন জলাশয়ে চিংড়ি ও কাঁকড়া চাষ করা যেতে পারে।

৩। খরাপ্রবণ এলাকা যেখানে বৃষ্টিপাত কম হয় সেখানে স্বল্প সময়ের পানিতে বড় পোনা চাষ করা যায়। এজন্য এলাকায় বড় পোনা মজুদ রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। তেলাপিয়া বেশ খরা সহনশীল একটি মাছ। খরা অঞ্চলে কই ও দেশি মাগুরের চাষও করা যেতে পারে।

৪। বন্যাপ্রবণ বা অধিক বৃষ্টিযুক্ত এলাকায় পুকুরের পাড় উঁচু করে বেঁধে দিতে হবে বা নেট দিয়ে ঘিরে দিতে হবে যেন বন্যার পানি পুকুরে প্রবেশ করতে না পারে বা পুকুর ভেসে মাছ বেরিয়ে যেতে না পারে।

৫। বন্যাপ্রবণ এলাকায় পুকুরের পাড় উঁচু করে সমাজভিত্তিক মৎস্য পোনা ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা যায়। ঐ এলাকায় যে সময়ে বন্যা হয় না সে সময়ে ঐ পোনা পুকুরে মজুদ করা যায়।

৬। বন্যাপ্রবণ এলাকায় বন্যার সময়টাতে খাঁচায় মাছ চাষ করা যেতে পারে।

৭। উপকূলীয় অঞ্চলে বাঁধ ভেঙে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি ও জনদুর্ভোগের এলাকাগুলোতে পরিকল্পিত মাছ চাষ, খাঁচায় মাছ চাষ ও কাঁকড়া চাষের মাধ্যমে সে পানিকে কাজে লাগানো যায়।

৮। দিন দিন পরিবেশের তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ায় তাপমাত্রা সহনশীল মাছ চাষ ও এদের পোনা উৎপাদনের ব্যবস্থা নেওয়া যায়। যেমন- মাগুর, রুই, শিং।

৯। তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ার ফলে পুকুরের পানি গরম হয়ে গেলে পুকুরে কয়েকটি নির্দিষ্ট স্থানে বাঁশের ফ্রেম তৈরি করে তাতে টোপাপানা রাখা যেতে পারে। এতে করে মাছ গরম থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এর নিচে অবস্থান নিতে পারবে। একই উদ্দেশ্যে পুকুরের পাড়ে পানির উপর কিছু লতানো উদ্ভিদ জন্মানোর সুযোগ দেওয়া যেতে পারে। প্রয়োজনে বাইরে থেকে কিছু পানি সেচ দেওয়া যেতে পারে।

১০। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সামুদ্রিক মৎস্য বিচরণ এলাকা পরিবর্তন হচ্ছে। ফলে তা যেন জেলেদের মৎস্য আহরণে ও জীবিকা নির্বাহে নেতিবাচক প্রভাব না ফেলে এ লক্ষ্যে নতুন বিচরণ এলাকাসমূহ চিহ্নিত করতে হবে। এ জন্য আধুনিক গবেষণা ও জরিপ গ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

জলবায়ু পরিবর্তনে পশুপাখির উপর প্রভাব

পৃথিবীর তাপমাত্রা ও মানুষ কর্তৃক পরিবেশ ধ্বংসই জলবায়ু পরিবর্তনের অন্যতম কারণ। আমাদের দেশ নিয়মিত বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেশে দেশে প্রতি নিয়ত আঘাত করছে। বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন-জলোচ্ছ্বাস, সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড়, প্রবল বায়ুপ্রবাহ, বন্যা ও খরা প্রভৃতি কারণে পশুপাখির ব্যাপক ক্ষতি হয়। ফলে খামার মালিক বা কৃষকরা অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হয় না। এ ক্ষতির পরিমাণ কিছুটা পুষিয়ে নেওয়ার জন্য দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে কতগুলো পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত। বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগের বাস্তবতা মেনে নিয়েই সামুদ্রিক ঝড়, টর্নেডো, বন্যা, খরা, পাহাড়ি ঢল, অতিবৃষ্টি ইত্যাদির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ বা সর্তকতামূলক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। ইতোমধ্যে উত্তরাঞ্চলের বরেন্দ্র ভূমির শালবন, রাজশাহী অঞ্চলের পত্নীতলা ও নজীপুরের জঙ্গল সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়েছে। যার ফলে এ অঞ্চলে প্রচণ্ড খরা হয়। এসব বনাঞ্চলের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ছাড়াও উপকূলীয় বনায়ন পরিকল্পনা, পার্বত্য চট্টগ্রামের অশ্রেণিভুক্ত বনাঞ্চলের বনায়ন সম্প্রসারণ, দেশের নদ-নদী খাল উদ্ধার ও পুনঃখনন এবং ছোট বড় পাহাড় রক্ষার পরিবেশ আইন অবিলম্বে কার্যকর করতে হবে। দেশের সামাজিক বনায়ন সম্প্রসারণসহ ব্যাপকভাবে গাছ লাগাতে হবে। এগুলো হচ্ছে দীর্ঘমেয়াদি স্থায়ী ব্যবস্থা। এসব বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নেওয়া হলে জলবায়ুর পরিবর্তনে পরিবেশ বিপর্যয়ের হাত থেকে দেশ তথা পশুপাখি রক্ষা করা যাবে। নিম্নে জলবায়ু পরিবর্তনে পশুপাখির সমস্যা মূল্যায়নের বিভিন্ন দিক আলোচনা করা হলো।

খরাজনিত সমস্যা : খরায় যে সকল সমস্যা দেখা যায় সেগুলো হচ্ছে –

- কাঁচা ঘাসের অভাব হয়।
- পানি দূষিত হয়।
- গবাদি পশু অপুষ্টিতে ভোগে।
- গবাদি পশুর বিভিন্ন রোগব্যাধি দেখা দেয়।
- মাঠ-ঘাটের ঘাস শুকিয়ে যায়।
- পশুর বহিঃদেশের পরজীবীর উপদ্রব বৃদ্ধি পায়।
- অধিক তাপ পশুপাখির অসহনীয় অবস্থার সৃষ্টি করে।
- গবাদি পশুর স্বাস্থ্যের অবনতিসহ মৃত্যুর আশঙ্কা দেখা যায়।
- তাপপীড়নে খামারে ব্রয়লার ও লেয়ার মুরগির মৃত্যু হয়।

বন্যাজনিত সমস্যা : বন্যা পরিস্থিতিতে যে সকল সমস্যা দেখা যায় সেগুলো হচ্ছে –

- জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়।
- দেশের অধিকাংশ এলাকা পানিতে ডুবে যায়।
- রোগব্যাধির প্রাদুর্ভাব ঘটে।
- গো-খাদ্য পাওয়া যায় না।
- পানি দুষিত হয়।
- পশুপাখি রক্ষণাবেক্ষণে সমস্যার সৃষ্টি হয়।
- গবাদি পশু অপুষ্টিতে ভোগে।
- বিভিন্ন সংক্রামক রোগ ও কৃমির আক্রমণ বৃদ্ধি পায়।
- ঘাসে বিষক্রিয়া সৃষ্টি হয়, গবাদি পশু অসুস্থ হয়ে পড়ে।
- পরিবেশ অস্বাস্থ্যকর হয়, অনেক পশুর মৃত্যু হয়।

জলোচ্ছ্বাসজনিত সমস্যা : জলোচ্ছ্বাসের সময় যে সকল সমস্যা দেখা যায় সেগুলো হচ্ছে –

- জলোচ্ছ্বাসকবলিত এলাকার পানি দূষিত হয়।
- জলোচ্ছ্বাস ও ঝড়ের ফলে বহু গবাদিপশু ও জীবজন্তু তাৎক্ষণিক মারা যায়।
- সৎকারের অভাবে মৃত পশুপাখি পরিবেশ দূষিত করে।
- পশু খাদ্যের অভাব দেখা দেয়।
- জীবিত গবাদি পশু উদরাময়, পেটের পীড়া ও পেট ফাঁপাসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে পশুপাখির অভিযোজন কলাকৌশল

কোনো প্রজাতি তার পরিবেশে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়ার কৌশলকে অভিযোজন বলে। মনে রাখতে হবে, পরিবেশ ও জীবের দেহের মধ্যে অভিযোজন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে থাকে। জীবের অভিযোজন পরিবেশের আবহাওয়া ও জলবায়ু দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। তাই অভিযোজন পরিবেশের তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, বায়ুপ্রবাহ ও বায়ুর উপাদান, সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ঐ স্থানের উচ্চতা এবং জীবের শারীরিক গঠন ও দৈহিক অবস্থা ইত্যাদির উপর নির্ভর করে। অভিযোজনের এসব উপাদান মোকাবেলা করেই জীব তার অবস্থানে টিকে থাকে। এটাই প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়ম।

কিন্তু হঠাৎ করে জলবায়ুর ব্যাপক কোনো পরিবর্তন হলে মানুষ তার বুদ্ধি দিয়ে নিজেকে রক্ষা করতে পারলেও পশুপাখি সেই পরিবেশে নিজেকে অভিযোজন করতে পারে না। কারণ পশুপাখি অসহায় ও নিরীহ প্রাণী। কোনো অঞ্চলে জলবায়ুর পরিবর্তন ধীরে ধীরে হলে অনেক পশুপাখি পরিবেশের সাথে অভিযোজন করতে সক্ষম হয়। পরিবেশে অভিযোজনে অক্ষম অনেক প্রজাতির বিলুপ্তিও ঘটে। প্রতিকূল ও বিরূপ পরিবেশে পশুপাখির অভিযোজনের জন্য মানুষের সাহায্যের প্রয়োজন। এক্ষেত্রে খরা, বন্যা ও জলোচ্ছ্বাসজনিত সমস্যা সমাধানের উপর অধিক গুরুত্ব দিতে হবে। এতে পশুপাখি অনেকাংশে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে সক্ষম হবে।

খরায় পশুপাখি রক্ষার কলাকৌশল

১। কাঁঠাল, ইপিল ইপিল, বাবলাসহ বিভিন্ন গাছের চাষ বৃদ্ধি করতে হবে এবং খরার সময় এসব গাছের পাতা পশুকে খাওয়াতে হবে।

২। খরার সময় পশুকে ভাতের মাড়, তরিতরকারির উচ্ছিষ্ট অংশ, কুঁড়া, গমের ভুসি, ডালের ভুসি, খৈল, চিটাগুড় পর্যাপ্ত পরিমাণে খাওয়াতে হবে।

৩। গবাদি পশুকে নিয়মিত সংক্রামক রোগের টিকা দিতে হবে।

৪। পশুকে কাঁচা ঘাসের সম্পূরক খাদ্য (যেমন - সবুজ অ্যালজি) খাওয়াতে হবে।

৫। খরা মৌসুম আসার পূর্বেই ঘাস দ্বারা সাইলেজ ও হে তৈরি করে রাখতে হবে। যা খরা মৌসুমে গবাদি পশুকে খাওয়ানো যাবে।

৬। গবাদি পশুকে শুষ্ক খড় না খাইয়ে ইউরিয়া দ্বারা প্রক্রিয়াজাত করা খড় ও ইউরিয়া মোলাসেস ব্লক খাওয়ানো যেতে পারে।

৭। গবাদির পশুকে পর্যাপ্ত দানাদার খাদ্য খাওয়াতে হবে।

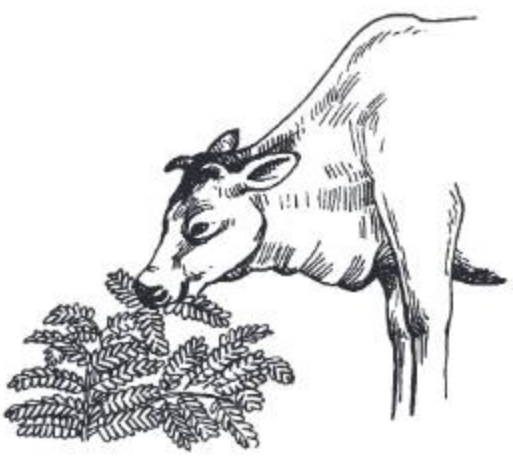

চিত্র : খরার সময় পশু ইপিল ইপিল পাতা খাচ্ছে

৮। পশুকে বেশি করে পরিষ্কার পানি খাওয়াতে হবে।

৯। পশুকে নিয়মিত গোসল করাতে হবে।

১০। পশুর শরীর সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে এবং পরজীবির জন্য চিকিৎসা করাতে হবে।

১১। পশুকে ছায়াযুক্ত স্থানে রাখতে হবে এবং প্রখর রোদে নেওয়া যাবে না।

১২। গবাদি পশু অসুস্থ হলে পশু ডাক্তারের পরামর্শ মোতাবেক চিকিৎসা করাতে হবে।

বন্যাজনিত সমস্যায় পশুপাখি রক্ষার কলাকৌশল

১। গবাদি পশুকে যথাসম্ভব উঁচু ও শুকনো জায়গায় রাখতে হবে।

২। গবাদি পশুকে পরিষ্কার পানি খাওয়াতে হবে, বন্যার দূষিত পানি খাওয়ানো যাবে না।

৩। গবাদি পশুর মৃতদেহ গর্তে পুঁতে ফেলতে হবে।

৪। বন্যার সময় গবাদি পশুকে খাদ্য হিসাবে খড়, চালের কুঁড়া, ভুসি ও খৈল বেশি পরিমাণে খাওয়াতে হবে।

৫। এ সময় কচুরিপানা, দলঘাস, লতাগুল্ম এমনকি কলাগাছও গবাদিপশুকে খাওয়ানো যেতে পারে।

৬। কাঁচা ঘাসের বিকল্প হিসাবে হে ও সাইলেজ খাওয়ানো যেতে পারে।

৭। বন্যার পানি নেমে যাওয়ার সাথে সাথে পতিত জমিতে বিভিন্ন জাতের ঘাসের বীজ ছিটিয়ে দিতে হবে।

৮। গবাদি পশুকে সংক্রামক রোগের টিকা দিতে হবে ও কৃমিনাশক বড়ি খাওয়াতে হবে।

৯। ডাক্তারের পরামর্শ মোতাবেক আক্রান্ত পশুকে চিকিৎসা করাতে হবে।

জলোচ্ছ্বাসজনিত সমস্যা মোকাবেলায় পশুপাখি রক্ষার কলাকৌশল

উপকূলীয় এলাকায় সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস একটি বিরাট প্রাকৃতিক দুর্যোগ। বছরের যেকোনো সময় জলোচ্ছ্বাস সমুদ্র-উপকূলীয় এলাকায় আঘাত হেনে গবাদি পশুর ব্যাপক ক্ষতিসাধন করতে পারে। আমাদের দেশের বিস্তৃর্ণ সমুদ্র-উপকূলীয় অঞ্চল ও দ্বীপগুলো জলোচ্ছ্বাসের কবলে পড়ে। তাই জলোচ্ছ্বাসের কবল থেকে গবাদিপশুকে রক্ষা করার জন্য নিম্নবর্ণিত ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ করতে হবে।

১। উঁচুস্থানে পশুপাখির বাসস্থানের ব্যবস্থা করা

২। জলোচ্ছ্বাস বা ঝড়ের সংকেত পাওয়ার সাথে সাথে গবাদি পশুকে উঁচু আশ্রয়স্থলে নিয়ে বেঁধে রাখা

৩। জলোচ্ছ্বাসের পর মৃত পশুকে মাটির নিচে চাপা দেওয়া

৪। এ সময় পশুর জন্য ভাতের মাড় ও জাউ, শুকনো খড় এবং দানাদার খাদ্যের ব্যবস্থা করা

৫। গবাদি পশুকে দানাদার খাদ্য যেমন-ভুসি, কুঁড়া, খৈল ও প্রয়োজনমতো লবণ খাওয়ানো

৬। গবাদি পশুকে কাঁচা ঘাসের পরিবর্তে বিভিন্ন গাছ-পাতা খাওয়ানো

৭। জলোচ্ছ্বাস কবলিত এলাকায় টিম গঠন করে পশুচিকিৎসার ব্যবস্থা করা

৮। গবাদি পশুকে নিয়মিত সংক্রামক রোগের টিকা দেওয়া

৯। গবাদি পশু যাতে পচা দূষিত পানি খেয়ে রোগাক্রান্ত হতে না পারে সেদিকে লক্ষ রাখা ইত্যাদি।

অনুশীলনী

বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

১. বিরূপ পরিবেশে ফসল উৎপাদনের পূর্বশর্ত কোনটি?

ক. উপযোগী ফসল নির্বাচন। খ. সঠিক জমি নির্বাচন।

গ. যথাযথ পরিচর্যা করা। ঘ. অধিক পরিমাণ সার প্রয়োগ।

২. খুলনা ও বাগেরহাট অঞ্চলে রোপা আমনের জনপ্রিয় জাত কোনটি?

ক. বালাম খ. দিশারি

গ. চান্দিনা ঘ. মুক্তা

৩. জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারণে আমাদের দেশে ফসল উৎপাদনে -

i. রোগবালাই বৃদ্ধি পাবে।

ii. জৈব পদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে।

iii. ভূমির উর্বরতা হ্রাস পাবে।

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৪. হ্যালোফাইটস জাতীয় উদ্ভিদ কোনটি?

ক. শিম খ. তুলা

গ. কেওড়া ঘ. বাইন

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৫ ও ৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

তাহের মিয়ার বাড়ি নেত্রকোনা জেলায়। আমন মৌসুমে ধানের বৃদ্ধির প্রাথমিক পর্যায়ে ১০-১৫ দিন পানির নিচে থাকায় আশানুরূপ ফলন পান না। আবার পাহাড়ি ঢলে প্রায় সময়ই পাকা বোরো ধান তলিয়ে যায়।

৫. তাহের মিয়া আমন মৌসুমে কোন জাতের ধানের চাষ করলে আশানুরূপ ফলন পাবেন?

ক. কিরণ (বি আর ২২) খ. ব্রি ধান ৫১

গ. ব্রি ধান ৪৫ ঘ. ব্রি ধান ৩৬

৬. বোরো মৌসুমে পাকা ধান নষ্ট না হওয়ার জন্য তাহের মিয়ার উচিত -

i. সঠিক সময়ে চারা রোপণ করা

ii. ব্রি ধান ২৮ ও ব্রি ধান ৪৫ জাতের ব্যবহার

iii. ব্রি ধান ৫১ ও ব্রি ধান ৪৫ জাতের ব্যবহার

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. সুজিত বাবুর বাড়ি সমুদ্র উপকূলবর্তী সাতক্ষীরা জেলায়। তিনি আবাদি জমিতে স্থানীয় জাতের ধান চাষ করে উৎপাদনে ব্যর্থ হন। এরপর কৃষি কর্মকর্তার পরামর্শে বিনা ধান-৮ চাষের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। একদিন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদর্শিত তথ্য চিত্র দেখে সুজিত বাবু লবণাক্ততা সহায়ক বিভিন্ন ফসলের চাষ সম্পর্কে অনেক তথ্যই জানতে পারলেন।

ক. লবণাক্ত সহিষ্ণু ফসল কাকে বলে?

খ. তাপমাত্রা কীভাবে কৃষি উৎপাদন ব্যাহত করে? ব্যাখ্যা করো।

গ. সুজিত বাবুর সিদ্ধান্তটি সঠিক কি না তা ব্যাখ্যা করো।

ঘ. সুজিত বাবুর এলাকায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কার্যক্রম মূল্যায়ন করো।

২. চিত্রার বাবা নিয়মিত চট্টগ্রামে হালদা নদী থেকে মাছের ডিম সংগ্রহ করে বিক্রি করে আসছেন। কিন্তু এ বছর চিত্রার বাবা আকাশের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস নিয়ে বললেন নির্দিষ্ট সময়ে কার্প জাতীয় মাছের ডিম সংগ্রহ করা সম্ভব হবে না। ফলে আয়-রোজগার কমে যাবে। তিনি এলাকায় মৎস্য সপ্তাহ চলাকালে শোভাযাত্রায় ও তথ্য চিত্রের মাধ্যমে মৎস্য সম্পদ কমে যাওয়ার কারণ জানতে পারেন।

ক. আবহাওয়া কাকে বলে?

খ. পরিবেশের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার একটি ক্ষতিকর দিক ব্যাখ্যা করো।

গ. চিত্রার বাবার ডিম সংগ্রহ করতে না পারার কারণ ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত শোভাযাত্রাটি কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে কীরূপ প্রভাব ফেলবে বিশ্লেষণ করো।